যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ২১ আগস্ট ২০১৭

# কলকাতা

যুগশঙ্খ-র সঙ্গে ৮ পাতার রঙিন ক্রোড়পত্র

## থার্ডআই ক্লিক: অফবিট কলকাতা

আজকের জেনারেশন অনেক বেশি টেক ফ্রেন্ডলি। সময়ের সাথে সাথে আপডেট হয়েছে বন্ধুত্বের ভার্সনও। প্রিয় বন্ধুদের খবর নিতে, আড্ডা দিতে রয়েছে ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, ইমো, হাইকি আরও কত কী। আঙুলের একটা টাচেই চোখের পলকে দেখে নেওয়া যাচ্ছে বন্ধুর মুখ। তার জন্য কে কোন জায়গায় আছে সেটা জরুরি নয়। অথচ পুরনো জেনারেশনের অনেকের কাছে এখনও সম্পর্কের অন্য মানে। বন্ধুত্বের অন্য হৃদ্যতা। একসাথে বসে বা হাঁটতে হাঁটতে তাদের আড্ডা বা বন্ধুত্বের রং কিন্তু আজও একটুও বদলায়নি...

ফোটো: **আশিসকান্তি সোম** | লেখা: **তন্ময় মণ্ডল**

## আমার চোখে কলকাতা

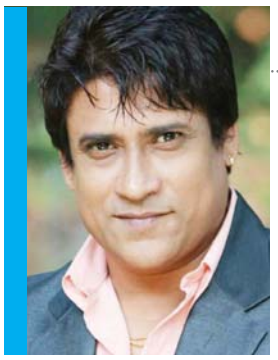

**দেবরাজ মুখোপাধ্যায়**
(অভিনেতা)

যে-শহরে আমি জন্মেছি এবং বড় হয়েছি সেই শহরের প্রতি আলাদা একটা ইমোশন তো থাকবেই। কলকাতা আমার ভালোলাগার, ভালোবাসার শহর। নিজের শহর খারাপ-ভালো যাই হোক না কেন সেটা তো নিজেরই। কলকাতার যে কোনও জায়গাই আমার প্রিয়— সে টালা ব্রিজ হতে পারে, চিড়িয়াখানা হতে পারে, সায়েন্স সিটিও হতে পারে। গঙ্গার ঘাটগুলোতে গেলেই মনটা শান্ত হয়ে যায়। বিকেলের আলোয় শহরটাকে নিজের মতো করে দেখার মজাই আলাদা। আর এই শহরটার একটা ভ্যারিয়েশন আছে উত্তর থেকে দক্ষিণে। উত্তর থেকে ক্রমশ বদলাতে বদলাতে দক্ষিণে এক্কেবারে অন্যরকম কলকাতা।

কলকাতা মানে চারিদিকে শুধু নস্টালজিয়া। আর কলকাতা মানেই একটা উন্মাদনা, সে ফুটবল নিয়েই হোক আর দুর্গাপুজো নিয়ে হোক। তবে আগের কলকাতা আর এখনকার কলকাতার মধ্যে প্রচুর চেঞ্জ এসেছে। কলকাতার সেই জমাটি আড্ডা নেই, বাঙালিয়ানার যে মজা সেটাও নানা কারণে অনেক কমে গেছে। আর সেই সরলতাটাও আগের মতো এখন আর পাই না। কলকাতার সেই একান্নবর্তী পরিবার, সেই ভালোবাসার আদান-প্রদান এখন আর নেই। এখন সবাই আইসোলেটেড।

এছাড়াও কলকাতায় পলিউশন অনেক বেড়ে গেছে। গাড়ি প্রচুর বেড়ে যাওয়ায় জ্যামও বেড়েছে। আমাদের ছোটবেলার কলকাতা আর এখনকার কলকাতার অনেক ফারাক। এই ব্যাপারগুলো নিয়ে শুধু প্রশাসন নয়, আমাদেরও একটু ভাবা উচিত।

কলকাতাকে আমার সবথেকে ভালো লাগে দুর্গাপুজোর সময়। সারা শহর সেজে ওঠে একটা অন্যরকম সাজে। তখন মানুষের মন এমনিতেই ভালো হয়ে যায়। তখন চারিদিকে একটা উৎসবের রেশ, খুশির আমেজ। তখন কলকাতাটাও হাসে। যাই হোক, ভালো-মন্দ সব মিশিয়েই আমাদের কলকাতা। কলকাতার যতই বদল আসুক পুরনো ঐতিহ্য তো আছেই। কলকাতা মানে একটা অন্যরকম আবেগ। সেটা আছে, থাকবেও।

## ডেইলি প্যাসেঞ্জার @ কলকাতা

# কারওর ভালো করতে চাইলেও...

**তনুশ্রী রায়চৌধুরী**

কেউ একজন বলেছিলেন জীবন মানেই ছুটে চলা। আমার তো মনে হয় জীবন মানে সুপারসোনিক বেগে শুধুই দৌড়নো। সকাল হলেই বাড়ির কাজ সেরে ট্রেন ধরবার তাড়া। ফের ট্রেন থেকে নেমে বাস ধরবার তাড়া। আমাদের মতো মহিলারা যারা ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করে, তাদের সংসার সামলে বাচ্চার স্কুল আর স্বামীর অফিসের সরঞ্জাম গুছিয়ে দিয়ে তবেই বেরোতে হয়। দীর্ঘ ছ'বছরে এই রুটিনের কিছুই বদলায়নি। আটটা বাহান্নর লোকাল ধরে বিধাননগর, তারপর সেখান থেকে বাসের ঝাঁকুনি খেতে খেতে রুবি। সময় যত না জোরে ছোটে, মনে হয় আমার ছুটে চলা তার চেয়ে অনেক বেশি জোরে।

ট্রেনে লেডিস কম্পার্টমেন্টে আমরা যারা একসাথে যাই, তাদের মধ্যে না চাইতেও একটা সহাবস্থানপূর্ণ বন্ধুত্ব হয়ে যায়। কখনও কখনও তো মিতাদি, জয়শ্রী এঁদের আমার আত্মার আত্মীয় বলেই মনে হয়। সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না একসাথে বারোমাসের জার্নি। সম্পর্ক তো তৈরি হবেই। কার মেয়ে কোন কলেজে পড়ছে কার ছেলের প্রেমে পড়ে উচ্ছন্নে গেছে এইসব আলোচনায় দেড় ঘণ্টা সময় কী করে যে কেটে যায়, বুঝতে পারি না।

ফেরার সময় অবশ্য সবার একসাথে ফেরা হয় না। সেখানে আলাদা একটা সার্কেল। কখনও কখনও জেনারেল কম্পার্টমেন্টেও উঠি। লেডিসে কেউ সিট দিক আর না দিক জেনারেলে ছেলেরা কিন্তু অনেকেই বেজায় ভদ্রলোক। অনেকের কাছে অনেক খারাপ খারাপ গল্প শুনলেও, আমি কিন্তু তেমন খারাপ কোনও ঘটনার সম্মুখীন হইনি। ছেলেরা কিন্তু সহানুভূতি বা সহমর্মিতা, যার খাতিরেই হোক সিট ছেড়ে দেয়।

সেইদিনটা এখনও আমার স্পষ্ট মনে আছে, রুবি থেকে বাসে উঠেছি। বিধাননগর নামব। ভিড় বাস, অফিসফেরত লোকের চাপ। দু'কানে হেডফোন গুঁজলাম একটু

রিল্যাক্সেশন পেতে, কিন্তু কিছুক্ষণ বাদে তাও ভালো লাগল না। বাইরে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছি গরমও পড়েছে খুব। হঠাৎ চিংড়িঘাটা আসতেই কন্ডাকটর চেঁচিয়ে উঠল, 'আস্তে লেডিস...।' মেয়েটা গেটের কাছেই দাঁড়িয়েছিল। প্রচণ্ড রেগে গিয়েই বলল, 'আস্তে লেডিস মানে কী? কই আস্তে জেন্টস তো বলেন না। মেয়েদের কী মনে করেন আপনারা?' মনে হল মেয়েটি স্পোর্টসম্যান হবে। রীতিমতো ঝগড়া শুরু করে দিল কন্ডাকটরের সাথে। কন্ডাক্টর তো থতমত খেয়ে গেছে। এতদিন তো এটাই বলে আসছে সে। উদ্দেশ্য তো মেয়েটি নয়, সে তো ড্রাইভারকে উদ্দেশ্য করেই বলেছিল কথাটা, যাতে গাড়িটা একটু স্লো করা হয়। মেয়েরা তো ছেলেদের মত অতো দৌড়ঝাঁপ করে ট্রেনে-বাসে উঠতে বা নামতে পারে না। এমনটাও হয় অনেক সময় কারওর ভালো করতে চাইলেও ঠিক তার উলটোটা হয়।

কলকাতা
যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ২১ আগস্ট ২০১৭



# আমহার্স্ট স্ট্রিট আজকের রামমোহন সরণি

**মৌমিতা ঘোষ**

কথিত আছে, জব চার্নক যখন কলকাতা নগরীর পত্তন করেন, তখন আমাদের এই শহর ছোট্ট একটুখানি জায়গা নিয়ে ছিল। তারপর আস্তে আস্তে শহরের পরিধি বিস্তৃত হয়। তৈরি হয় নতুন নতুন রাস্তাঘাট। কলকাতা মহানগরীর রূপ নেয়। এই পালটে যাওয়া কলকাতায় তৈরি হতে থাকে একের পর এক নতুন রাস্তা। আর এখন তো শিরা-উপশিরার মতো সারা শহর জুড়ে ছড়িয়ে আছে অজস্র রাস্তা।

প্রাচীন কলকাতার শতাব্দীপ্রাচীন রাস্তাঘাটগুলোর মধ্যে অন্যতম হল আমহার্স্ট স্ট্রিট। এই রাস্তাটি কলকাতার গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহ্যপূর্ণ রাস্তাগুলির মধ্যে অন্যতম। ব্রিটিশ আমলেই উইলিয়াম আমহার্স্ট-এর নামানুসারে রাস্তাটির নাম হয় আমহার্স্ট স্ট্রিট। ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায় এই রাস্তার ওপর অবস্থিত ৮৫ নম্বর বাড়িতে বসবাস করেছিলেন বেশ কিছু বছর (১৮১৪ সাল পর্যন্ত)। তাই তাঁর নামানুসারে ১৯৬৮ সালের ২ ফেব্রুয়ারি রাস্তাটির নাম বদলে রাখা হয় রাজা রামমোহন রায় সরণি, যা রাস্তাটির বর্তমান নাম। আমহার্স্ট স্ট্রিট পোস্ট অফিসেরও নাম বদলে রাখা হয় রাজা রামমোহন রায় সরণি পোস্ট অফিস। কলকাতার পতিতালয়ের শিশুদের নিয়ে তৈরি 'Born into Brothels' ছবিতে এই রাস্তাটির উল্লেখ পাওয়া যায়।

নাম পরিবর্তিত হলেও সাধারণ মানুষের কাছে এখনও এই রাস্তা আমহার্স্ট স্ট্রিট নামেই পরিচিত। মধ্য কলকাতার এই রাস্তাটির বিস্তৃতি উত্তর থেকে মধ্য কলকাতা পর্যন্ত। উত্তরে রাজা রামমোহন রায় মেমোরিয়াল মিউজিয়াম থেকে মধ্য কলকাতার বউবাজারের ব্যাংক অব ইন্ডিয়া পর্যন্ত এই রাস্তাটির সীমানা। অর্থাৎ উত্তরে বিবেকানন্দ রোড বা মানিকতলা স্ট্রিট থেকে শুরু করে দক্ষিণে বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিট বা বউবাজার স্ট্রিট পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে এই আমহার্স্ট স্ট্রিট। এই রাস্তার দু'ধারে রয়েছে বহু ঐতিহ্যবাহী নিদর্শন, যা ইতিহাসের অনেক সাক্ষ্য বহন করে।

কলেজ স্ট্রিটের নিকটবর্তী এই রাস্তাটিতে রয়েছে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এর মধ্যে অন্যতম হল সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল মিশন কলেজ, যা সেন্ট পলস কলেজ নামে পরিচিত। ১৮৬৪ সালে প্রতিষ্ঠিত এই শতাব্দীপ্রাচীন কলেজটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকৃত। কলকাতার আরেকটি প্রাচীন কলেজ 'সিটি কলেজ' এখানে অবস্থিত। ১৮৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত এই কলেজটির প্রাক্তনী বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি। রামকৃষ্ণ মিশনের প্রেসিডেন্ট স্বামী শুদ্ধানন্দ থেকে শুরু করে অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, হারাধন

বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়, রজনীকান্ত সেন, বর্তমান পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা বরুণ সেনগুপ্ত— সকলেই এই কলেজের ছাত্র।

ঊনবিংশ শতকে বাংলার নবজাগরণে এই কলেজটির সক্রিয় ভূমিকা ছিল। সিটি কলেজের সান্ধ্য বিভাগ শুরু হয় ১৯৬১ সালে, যা আনন্দমোহন কলেজ নামে পরিচিত। সিটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ব্রাহ্মসভার একজন পুরোধা আনন্দমোহন বসু, তাঁর নামানুসারেই এই সান্ধ্য কলেজের নাম হয় আনন্দমোহন কলেজ। এই রাস্তার ওপরেই রয়েছে লরেন্স ডে স্কুল।

এই রাস্তাটির ওপর রয়েছে শ্রীবিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী মারওয়াড়ি হাসপাতাল, যা 'মারওয়াড়ি হাসপাতাল' নামে পরিচিত। বহু গরিব মানুষের বিনামূল্যে চিকিৎসা করা হয় এখানে। এর কাছেই রয়েছে বোস ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরি। কলকাতার অন্যতম উৎসব দুর্গাপুজোতেও এই রাস্তা সেজে ওঠে অপরূপ সাজে। উত্তর কলকাতার অন্যতম পুজো চালতাবাগান লোহাপট্টির দুর্গাপুজো এই আমহার্স্ট স্ট্রিট-সংলগ্ন। আর দুর্গাপুজোর রেশ মিটতে না মিটতেই আমহার্স্ট স্ট্রিট সেজে ওঠে আলোর মালায়। আমহার্স্ট স্ট্রিট সর্বজনীন কালীপুজো এখানকার অন্যতম আকর্ষণ। সত্তর দশকের রাজনৈতিক আন্দোলনের সাক্ষী এই আমহার্স্ট স্ট্রিট। সমগ্র কলকাতাবাসীর জনজীবনে এই রাস্তা মিশে রয়েছে এভাবেই বহু বছর ধরে। সময়ের ধারায় বদলেছে কলকাতার চালচিত্র তবুও এই রাস্তা তার সত্তা, পুরনো গন্ধ নিয়ে যেন তাকিয়ে আছে অতীতে ফেলে আসা পৃষ্ঠাগুলোর দিকে।



# বেতার নাটক ও তার ইতিহাস

**মনীষা ভট্টাচার্য**

পর্ব-১৩

'ক্রিং ক্রিং!

পু: হ্যাঁলো

না: অলোকবাবু

পু: বলছি

না: সুপ্রভাত

পু: সুপ্রভাত

না: আমায় আপনি চিনবেন না। অনেকদিন ধরেই ভাবছি আপনার সঙ্গে আলাপ করব। আজ ফোনটা করেই ফেললাম।

পু: তা আপনি কে?

না: আমি আপনার ফ্যান।

পু: ফ্যান

না: আপনার সম্প্রতি 'কলকাতা হে রমণী' নামক যে কবিতার বইটা বেরিয়েছে আমি সেটা এবার বইমেলা থেকে কিনেছি।

পু: পড়েছেন?

না: প্রথম কবিতার শেষ দুটো লাইন তো আমায় সবসময় হন্ট করছে। 'আমাকে আঘাত কর, আমাকে চিৎকার করে ডাকো হে রমণী, আমার নিঃসঙ্গতা লজ্জাবস্ত্র হয়ে তুমি ঢাক।'

পু: আমি কি জানতে পারি আপনি কে?

না: উহু, পারেন না। কাল রাত দশটায় টেলিফোন করতে পারি?'

উপরের এই সংলাপ নিরূপ মিত্রের লেখা একটি জনপ্রিয় বেতার নাটকের। নাটকের নাম 'দূরাভাষ'। বেতার নাটক— এই শব্দবন্ধটির সঙ্গে পরিচিত আমরা সবাই। রেডিওতে নাটক আমরা শুনিনি এমন বোধহয় একজনও নেই। বর্তমান জনপ্রিয় মাধ্যম এফএম তরঙ্গেও নাটক প্রচারিত হয়। আকাশবাণীর জন্মলগ্ন থেকেই নাটক প্রচারিত হয়ে আসছে। আজ সেই বেতার নাটকের নানা কথা, নানা গল্প।

অহীন্দ্র চৌধুরী

শিশিরকুমার ভাদুড়ী

১৯২৭ সালের ৩ সেপ্টেম্বর রাত ৯.৪৫ মিনিটে বেতারকেন্দ্রে প্রথম মাইক্রোড্রামা শীর্ষক নাট্যধর্মী অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। 'ইউরোপীয়ানদের জন্য' অনুষ্ঠানে ওই সালেই দুটি ইংরেজি নাটকও প্রচারিত হয়। তবে বেতারনাটক কলকাতা বেতারকেন্দ্রে শুরু হয় ১৯২৭ সালের ১৬ ডিসেম্বর। প্রথম বাংলা নাটকটি ছিল ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ রচিত 'নরনারায়ণ'। নাটকটিতে কর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন শিশিরকুমার ভাদুড়ী। প্রথমে নাট্যবিভাগের দায়িত্বে ছিলেন হিরেন বসু। সেই সময় শ্যামবাজারের 'চিত্রাসংসদ' ক্লাবের কয়েকজন প্রতিভাবান সদস্যকে ডাকা হয় আকাশবাণীতে। সেই প্রতিভাবান সদস্যদের মধ্যে ছিলেন বাণীকুমার, পঙ্কজকুমার মল্লিক, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, সত্য দত্ত প্রমুখ। এই ক্লাবের সদস্যরা পরিবেশন করেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দায়ে পড়ে দারগ্রহ' নাটকটি। এই নাটকের সফলতায় এই সদস্যদের নিয়ে তৈরি হল 'বেতার নাটুকে দল'। এই নামকরণ করেন প্রথম ভারতীয় প্রোগ্রাম ডিরেক্টর নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার। এই সময়ই নৃপেনবাবুর নজরে পড়েন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। চিত্রাসংসদ পরিবেশিত সকল নাটকের পরিচালনা ও অভিনয় নৈপুণ্যই ছিল বীরেনবাবুর নজরে পরার কারণ। এই সময় থেকেই নৃপেনবাবু বীরেনবাবুকে কলকাতা বেতারের নাট্যবিভাগের ভার দিলেন। 'বেতার নাটুকে দল'-এর হয়ে সব নাটকই তিনি পরিচালনা করতেন, সঙ্গে ছিল তাঁর অভিনয়ও।

১৯৩৭ সালে 'বেতার নাটুকে দল'-এর পরিবর্তে 'এআইআর প্লেয়ার্স' কর্তৃক পরিবেশিত হতো নাটকগুলি। পরিচালনার ভার ছিল বীরেনবাবুর উপরেই। শুরুর দিকে নাটক প্রচারিত হতো সরাসরি। প্রথম দিকে ২০-২৫ মিনিটের ছোট ছোট নাটক প্রচারিত হতো। এছাড়া প্রতি শুক্রবার আড়াই থেকে তিন ঘণ্টার নাটক প্রচারিত হতো। শুধু 'বেতার নাটুকে দল' কিংবা 'এআইআর প্লেয়ার্স' নয়, সেই সময় রেডিওতে নাটক পরিবেশন করতেন নাট্যমন্দির, আড়িয়াদহ বান্ধব নাট্যসমাজ, বাণী সংঘ, মিলন মন্দির, শ্রীরূপ মন্দির, কালীঘাট মিলন সমিতি সহ আরও অনেক দল।

মঞ্চাভিনেতা নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর বেতার নাটকে অভিনয় একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তাঁর পরিচালনায় নাট্যমন্দির সংস্থা 'বসন্তলীলা' গীতিনাট্য পরিবেশন করে। কলকাতা বেতারের প্রথম সামাজিক নাটক শরৎচন্দ্রের 'দেনাপাওনা' উপন্যাসের নাট্যরূপ 'ষোড়শী'-তে 'জীবানন্দ' চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন শিশিরকুমার ভাদুড়ী। মূলত সেই সময় পৌরাণিক নাটক, সামাজিক নাটকই প্রচারিত হতো, পাশাপাশি বিভিন্ন ছোটগল্পের বেতার নাট্যরূপ, বিভিন্ন নাট্যকারের নাটকও পরিবেশিত হতো। নাটকের অভাবের জন্য এমনও হয়েছে যে, মঞ্চ থেকে সরাসরি নাটক প্রচার করা হয়েছে। নাটকের এই অভাবের কথা 'বেতার জগৎ'-এ 'আমাদের কথা' বিভাগে পাওয়া যায়। 'যে কটি বেতারনাটক পাওয়া যায় তাও বেতার উপযোগী নয়, তবু আমরা অনেক পরিশ্রমে সেগুলিকে বেতার উপযোগী করে নিয়ে থাকি। এই সমস্ত বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে নাট্যবিভাগকে বাঁচিয়ে রাখা যে কীরকম দুঃসাধ্য কার্য তা আপনারা একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবেন।'

এই সময় বীরেনবাবু দেখলেন যে মঞ্চ থেকে এইভাবে সরাসরি নাটক প্রচার সম্ভব নয়। এতে দর্শকের মন্তব্য, হাততালি, চেঁচামেচি, সে-সবও রেডিওতে ধরা পড়ে। তাই বীরেনবাবু প্রতি সপ্তাহে বিভিন্ন স্বাদের নাটক পরিবেশনের ব্যবস্থা করলেন, আর সেই সব নাটকে অভিনয়ের জন্য বেতারে আমন্ত্রণ জানালেন তৎকালীন রঙ্গমঞ্চের খ্যাতনামা শিল্পীদের। শ্রোতারা পেলেন অহীন্দ্র চৌধুরী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেশচন্দ্র মিত্র, ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, মিস নিভাননী, আঙুরবালা, সরযূবালা, মলিনা দেবী, শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র সহ আরও কণ্ঠস্বর। পাশাপাশি পাওয়া গেল অনেক নাট্যকারদের। রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, ডি এল রায়, মাইকেল মধুসূদন এঁরা তো ছিলেনই, তার সঙ্গে গিরিশচন্দ্র ঘোষ, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, তুলসী লাহিড়ী, মন্মথ রায়, অমৃতলাল বসু, পরিমল গোস্বামী, বনফুল, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, জয়ন্ত চৌধুরী প্রমুখ। এছাড়া অগতির গতি বীরেন্দ্রকৃষ্ণ নিজে তো ছিলেনই। মনোজ মিত্র এক জায়গায় বলছেন, 'একটা ছোট ঘরে একাই বসতেন বাণীকুমার। উঁকি দিলেই দেখা যেত হেঁটমুণ্ডে বাণীবাবু হয় লিখছেন, নয় কীসব কাটাকুটি করছেন। টেবিলের ডাইনে বাঁয়ে সবসময় দুই মস্ত ঢিপি। ডাঁইকরা পাণ্ডুলিপির পাহাড়। প্রতিদিন ডাকে আসা অনাহূত বেতারনাটক। ...পুরু লেন্সের চশমা এঁটে পাতার পর পাতা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জরিপ করে যেতেন প্রবীণ মানুষটি।'

পাণ্ডুলিপির পাহাড় থেকে কী জরিপ করতেন বাণীকুমার? আসলে যে-সব নাটক আসত, তা প্রায় সবই মঞ্চ নাটককে মাথায় রেখে লেখা। রেডিওতে তো স্টেজ নেই, লাইট নেই। অহীন্দ্র চৌধুরী তাঁর স্মৃতিকথায় লিখছেন, 'আমার তো মনে হয়, বেতার নাটকের অভিনয়ে অভিনেতার দায়িত্ব অনেক বেশি। এখানে দর্শককে চোখে দেখা যায় না, এখানে সাজসজ্জার বালাই নেই, এখানে মঞ্চের মায়া নেই। সুতরাং অভিনয়ের ত্রুটি অন্যদিক থেকে পূরণ করার কোনও উপায় নেই। একমাত্র যথার্থ অভিনয় দিয়েই বেতার শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করতে হবে। ...সুতরাং বেতার নাটকের অভিনয় জমানো রীতিমতো শক্ত ব্যাপার।'

সুতরাং একটা কথা বোঝা যাচ্ছে, যে-নাটকে স্টেজ নেই, আলো নেই, মেকআপ নেই, ড্রেস নেই, দর্শকও অদৃশ্য, সেখানে কণ্ঠ ও মিউজিক এফেক্টই প্রধান উপজীব্য। এই আবহের ক্ষেত্রেও বীরেনবাবুর জুড়ি মেলা ভার। শুধু নাটক লেখা নয়, গান লিখে, তাতে সুর দিয়ে, কুশীলবদের তুলিয়েও দিয়েছেন তিনি। জনপ্রিয়তা যে পেয়েছিল সেইসব নাটক এ-কথা বলাই বাহুল্য। বেতারনাটক ও তার ইতিহাসের কথা এত স্বল্প পরিসরে শেষ করা সম্ভব নয়। তাই আগামী পর্বে বেতারনাটক নিয়ে আরও অনেক অজানা তথ্য দিয়ে সাজাব বেতার কথা।

কলকাতা
যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ২১ আগস্ট ২০১৭

# রাধাকান্তর পরাজয়

**বীথি চট্টোপাধ্যায়**
(লেখিকা)

হিন্দু কলেজের চারদিকে ঘন জঙ্গল ছেয়ে রয়েছে। বট, অশ্বত্থ, নিম, জামরুল গাছে পরিবেষ্টিত এই অঞ্চল। অদূরে অতি বিরাট একটি দিঘি। সেই দিঘির চারপাশে দুপুরবেলা মাছ ধরবার জন্য ঠিক যেন ধ্যানমগ্ন হয়ে সারিবদ্ধভাবে উপবেশন করে শৃগালের পাল। রাত্রে তারা আবার হুক্কা-হুয়া স্বরে তীব্র চিৎকার করে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে। সুবিশাল জলাশয়ের পাশে এত শৃগালের বসতি ছিল বলে জায়গাটিকে অনেকে শিয়ালদহ বলে অভিহিত করে। এই অঞ্চলে মানুষের বসতি প্রায় নেই বললেই চলে। একটু দূরে চিৎপুর আর জোড়াসাঁকো গেলে দেখা যাবে কল্লোলিনী কলকাতার মানুষের জনজীবন। প্রচুর গাছ কেটে শুধু এখানে গড়ে উঠেছে হিন্দু কলেজ নামের এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। একটু দূরে অবশ্য সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জনের জন্য আর একটি কলেজ নির্মিত হয়েছে। হিন্দু কলেজের পিছনে গড়ে উঠেছে হিন্দু স্কুল।

হিন্দু কলেজের বাইরে আজ ছায়াঘেরা স্নিগ্ধ একটি দ্বিপ্রহর গড়িয়ে যাচ্ছে বিকেলের দিকে। কিন্তু কলেজের ভিতরে আজ গনগন করে ঝরে পড়ছে উত্তপ্ত আগুনের খরতপ্ত হলকা। শোভাবাজার রাজবাড়ির প্রাণপুরুষ রাধাকান্ত দেব আর ব্রাহ্মসমাজের রাজা রামমোহন রায়ের মধ্যে যে তর্কাতর্কি আজ সকালে শুরু হয়েছিল তা যেন কলহে পর্যবসিত হতে চলেছে।

জমিদারপুত্র রাধাকান্ত দেব চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ব্যক্তিগত স্তরে আক্রমণ শুরু করেছেন রামমোহন রায়কে।

রাধাকান্তর বক্তব্য স্পষ্ট— তিনি নিজেকে একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু সন্তান মনে করেন। তাঁরই হাতে প্রতিষ্ঠিত এই হিন্দু কলেজ। তাঁর প্রতিষ্ঠানের ভিতর হিন্দুধর্ম বিরোধী কোনও কথা তিনি সহ্য করবেন না। হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও নামে এক খ্রিস্টান অধ্যাপককে রামমোহন এই কলেজের অধ্যক্ষ করেছিলেন। তখন রাধাকান্ত বাধা দেননি। কিন্তু তা বলে যে সেই ডিরোজিও রীতিমতো কনফারেন্স করে ছাত্রদের মাথায় হিন্দুধর্ম বিরোধী বিষ ঢালতে পারেন তা রাধাকান্ত স্বপ্নেও ভাবেননি। ইতিমধ্যেই ডিরোজিওর মাথায় পাঁক আর বর্জ্য ঢেলেছেন একদল গোঁড়া হিন্দু ছাত্র। রাধাকান্ত এইসব অশান্তিও তাঁর শিক্ষাঙ্গনে বরদাস্ত করতে চান না। কলেজে ছাত্রদের মধ্যে দুটো দল তৈরি হয়েছে। একদল চূড়ান্ত হিন্দুধর্মের বিরোধিতা করতে গিয়ে সত্যি বোধহয় কলেজে যে তাঁরা লেখাপড়া করতে এসেছেন সে-কথা বিস্মৃত হয়ে এমন করছেন যেন হিন্দুধর্মের গোঁড়ামির বিরোধিতা আর জোরদার আন্দোলন করার জন্যই তাঁরা কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। 'ইয়ং বেঙ্গল' নাম নিয়ে একটা দল করেছে এঁরা। ডিরোজিওর কাছে বসে তার নির্দেশে তাঁরা কলেজ চত্বরেই শুরু করছে হিন্দু ধর্মের নিয়ম ভাঙার আলোড়ন। আর একদল ছাত্র প্রবল হিন্দুত্ববাদী, তাঁরা ডিরোজিওর ভক্ত এই ইয়ং বেঙ্গলের অতি বিপ্লবী ছাত্রদের দেখলেই পালটা মার দিচ্ছে। কলেজে শিক্ষার পরিবেশ ডকে উঠছে। নিজের সন্তানস্নেহে গড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এরকম হুজ্জতি রাধাকান্ত কেনই-বা মেনে নেবেন? কিন্তু একা রাধাকান্তর হাতে তো আর এই প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়নি। ইংরেজ শিক্ষাব্রতী ডেভিড হেয়ার থেকে শুরু করে কলকাতায় ব্রিটিশ নির্মিত ন্যায়ালয়ের প্রধান বিচারপতি স্যার এডওয়ার্ড ইস্ট, ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায় সহ একাধিক ব্যক্তির দানে ও পরিশ্রমে এই প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এমনকী জানবাজারের রানি রাসমণিও অর্থ সাহায্য করেছেন এই হিন্দু কলেজ গড়ে তুলতে। ফলে শোভাবাজারের রাধাকান্তর একার হাতে এই প্রতিষ্ঠানের সম্পূর্ণ রাশ নেই। কিন্তু রাধাকান্ত আজ যেন প্রতিজ্ঞা করে এসেছেন ডিরোজিও নামের একটি সমস্যাকে তিনি আজ তাঁর কলেজ থেকে উৎখাত করে কলেজে পড়াশোনার পরিবেশ ফিরিয়ে আনবেন। কলেজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠাতা গণ্যমান্য ব্যক্তিরা কেউ রাধাকান্তর সঙ্গে ঝামেলায় জড়াতে চাইছেন না। ডিরোজিওকে যদি রাধাকান্ত বহিষ্কার করতে চান তো করুন। বিশিষ্ট আর ভদ্র পরিবারের হিন্দুদের পুত্রসন্তানরা শুধু এই হিন্দু কলেজে পড়বার উপযুক্ত। ডিরোজিও সেখানে এসে যদি একদল ছাত্রকে খেপিয়ে হিন্দুয়ারির চরম বিরোধিতার দিকে ছাত্রদের নিয়ে যেতে চায় সেক্ষেত্রে কে ডিরোজিওর পাশে দাঁড়াবেন? কেউ-ই ডিরোজিওকে সমর্থন করলেন না প্রকাশ্যে। রাধাকান্ত অতি সহজে ডিরোজিওকে কলেজ থেকে বহিষ্কার করতে পারতেন। রাধাকান্ত তা পারলেন না শুধু রামমোহন রায়ের জন্যে। সতীদাহ প্রথা পণ্ড করা আর বঙ্গ সমাজে সর্বদা পশ্চিমি কালচারের আমদানি করা একটি মানুষ ডিরোজিওকে সমর্থন করলেন বলে। রাধাকান্তর সঙ্গে তাল-তুমুল লেগে গেল রামমোহনের।

রাধাকান্ত জানতে চাইলেন কলেজে যে বিশৃঙ্খল, উচ্ছৃঙ্খলতা চলছে তাতে যদি বড় রকমের কোনও অঘটন ঘটে যায়। কোনও ছাত্র যদি গুরুতর আহত হয় তার দায় কি রামমোহন নেবেন?

রামমোহন জানালেন যে কলেজে পড়াশোনা ছাড়া অন্য উপসর্গ বেশি বেড়ে যাক, তা তিনিও চান না। তবে তিনি এটাও মানেন যে ডিরোজিও যে-কথাগুলো বলছেন সেগুলোয় যুক্তি রয়েছে।

ফুঁসে উঠলেন রাধাকান্ত, ডিরোজিও চায় হিন্দুধর্ম ধ্বংস হোক, হিন্দু সমাজ রসাতলে যাক। ডোম, চণ্ডাল, মুচি, মেথরের ছেলেপিলেরা এই কলেজে এসে লেখাপড়া করুক বর্ণহিন্দুদের পাশে বসে। এখানেই শেষ নয়, ডিরোজিও লোকটার মাথায় ছিট আছে, না হলে সে বলছে যে হিন্দু কলেজের দরজা সব জাতের জন্যে খুলে দেওয়া হলেই কাজ শেষ হবে না। স্ত্রীলোকদেরও এখানে পড়াশোনা করবার অধিকার দিতে হবে। সম্পূর্ণ পারভার্ট ছাড়া এমন কথা কেউ বলতে পারে বলে রাধাকান্ত স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না। ভদ্র ঘরের স্ত্রীলোকেরা ব্যাটাছেলেদের পাশে বসে পড়াশোনা করবে? এই কথা কোনও ভদ্রলোক কখনও মুখে উচ্চারণ করতে পারে?

রামমোহন নিজের যুক্তি সাজাচ্ছিলেন। তিনি বললেন ডিরোজিও সাহেব কিন্তু হিন্দু ধর্মের বিরোধিতা করেননি। হিন্দু ধর্মের নাম দিয়ে যেসব কুসংস্কার চলে আসছে তিনি তারই বিরোধিতা করেছেন। হিন্দুধর্ম নারীশিক্ষার বিরোধী কখনওই নয়। হিন্দুধর্ম একটি অতি উচ্চস্তরের দর্শনও। নিশ্চিত সেই ধর্মের নাম কলঙ্কিত করে কিছু স্বার্থজীবী কুপ্রথাকে টিকিয়ে রাখছেন নিজেদের স্বার্থে। এতে তো হিন্দুধর্মেরই অপমান হচ্ছে। সতীদাহ, বহুবিবাহের মতো প্রথাগুলো কেন হিন্দু ধর্মের ওপর চেপে বসবে? শ্রীরামচন্দ্রও তো বহুবিবাহ করেননি।

এবারে সার্বিক ধৈর্যচ্যুতি ঘটল রাধাকান্তর। রাখুন মশাই আপনার রামচন্দ্র। সে সত্যযুগ আর এটা কলিযুগ। পুরুষমানুষের একটা বিয়ে করবার বর্বর প্রথা এই কলিযুগে চলতে পারে না। আপনি ব্রিটিশের সাহায্যে সতীদাহ বন্ধ করে কি ভেবেছেন যে সমাজটা আপনার হাতের তেলোয় নাচবে? আজ আমি সকলের সামনে একটা কথা বলছি, হয় ডিরোজিও এই কলেজে থাকবে, না হলে রাধাকান্ত। যদি ডিরোজিওর ছায়া কখনও এই কলেজে দেখা যায় রাধাকান্ত সেদিন এই শেষবার এই কলেজ ছেড়ে বেরোবে আর এখানে কখনও ঢুকবে না।

কলেজের গণ্যমান্যরা সেদিন কেউ-ই ডিরোজিও-কে রেখে দিয়ে রাধাকান্তকে হারাতে চাননি। ফলে সেদিন জিতেছিলেন রাধাকান্তই। কিন্তু প্রায় দুশো বছর পর আজও ওই কলেজ থেকে ডিরোজিওর ছায়া মুছে দিতে পারেননি রাধাকান্ত।

প্রেসিডেন্সি কলেজের পোর্টিকোতে ছেলেদের পাশে বসে মেয়েরা যখন সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে আকাশের দিকে তাকায় তখন মেঘের আড়াল থেকে কৌতুকের হাসি ছুঁড়ে দেন হেনরি ভিভিয়ান ডিরোজিও। তিনি ভাবেন রাধাকান্ত ভাগ্যিস আর এই কলেজের ধারে-কাছে কোথাও নেই। কারণ রাধাকান্ত যে সহ্য করতে পারতেন না এই তীব্রতর দৃশ্য। যে দৃশ্যের ভিতর রাধাকান্তর অপরিসীম পরাজয় লুকিয়ে রয়েছে।

যুগশঙ্খ SUPPLI team
ক ল কা তা
**শর্মিলা চন্দ্র** (কো-অর্ডিনেটর ও সাব-এডিটর), **তন্ময় মণ্ডল** (সাব-এডিটর), **সুদীপ্ত বিশ্বাস, অতনু পাল**

# চায়ের বাঙালি, না বাঙালির চা

**জয় চক্রবর্তী**

‘এককাপ চায়ে আমি তোমাকে চাই।’— কী ধরনের চা খেতে খেতে গীতিকার জনপ্রিয় এই গানটি লিখেছিলেন তা জানা নেই বা কী ধরনের চা খেতে খেতে তাঁর প্রিয়তমাকে চেয়েছিলেন তাও জানা নেই। যখন এই গান লেখা হয়েছিল তখন অবশ্য চা-এর এত প্রকারভেদ ছিল কি না তা নিয়ে সন্দেহ আছে। আর থাকলেও হয়তো এত প্রচার ছিল না। যেভাবে জীবনমুখী গান থেকে বাঙালি ধীরে ধীরে ব্যান্ড কালচারে অভ্যস্ত হয়ে পড়ল সেভাবেই ক্রমশ দার্জিলিং বা অসম চা থেকে ইনস্ট্যান্ট লেমন টি বা গ্রিন টি-তে অভ্যস্ত হতে শুরু করল। শুধু চা কেন? গত কয়েক বছরে কলকাতার মানুষের জীবনে নানা ক্ষেত্রেই আমুল পরিবর্তন হয়েছে। সেটা সকালের চা থেকে শুরু করে রাতে শুতে যাবার সময় পর্যন্ত প্রায় সমস্ত কিছুতেই পরিবর্তন এসেছে। এই যেমন ধরা যাক আগে কলকাতার লোকেরা সকালে একটু মাঠে যেতেন শরীরচর্চা করতে। এখন তার বদলে জিমে যান। আবার রাতে একান্নবর্তী পরিবার একসাথে বসে খেতে পছন্দ করত। এখন সেটাই হয় তবে মায়ের হাতের রান্নার বদলে সেটা কোনও রেস্তোরাঁয় বা কখনও কখনও পারিবারিক পার্টি হচ্ছে বার বা পাবগুলিতে। যুক্তির খাতিরে অনেকেই বলেন, সময় বাঁচাতেই এই সব ব্যবস্থা। যদিও অনেকে আবার সেই যুক্তি মানতে নারাজ। তাঁরা বলেন, গ্রিন টি বা লেমন টি শুধু যে সময় বাঁচানোর জন্য বা ঝামেলা কমানোর জন্য তা তো নয়, এটা স্বাস্থ্যের পক্ষেও ভালো। কিন্তু তা হলে মাঠে গিয়ে শরীরচর্চা না করে গ্রিন টি খেয়ে বা জিমে গিয়ে কেন করতে হচ্ছে?

কথিত আছে, বাঙালির চা খাওয়া শেখা ইংরেজদের থেকে। কিন্তু এটাও বলতে হবে যে দার্জিলিংয়ে চা তার আগে থেকে উৎপন্ন হতো। তবুও সেই চায়ের স্বাদ বাঙালির এখনও সেইভাবে পাওয়া হয়নি। কারণ দার্জিলিংয়ে উৎপন্ন হওয়া বেশিরভাগ চা-ই বিশ্বে রপ্তানি হয়ে যায়। অবশিষ্টাংশ বাংলার মানুষ পেয়ে থাকেন। প্রায় একশতক সেই চা-ই ছিল বাঙালির সকালের প্রথম পানীয়। বাঙালির মনে এই চা-এর প্রতি যে প্রেম ছিল তার জায়গা ক্রমশ ছিনিয়ে নিচ্ছে গ্রিন টি, ইনস্ট্যান্ট টি বা লেমন টি। যা গরম জলে দিয়ে দিলেই তৈরি হয়ে যায়। সময়ও কম লাগে খেতেও তুলনামূলকভাবে সুস্বাদু। আবার দামও তুলনায় কম। তাহলে কেন মানুষ দার্জিলিং বা অসম চা বেশি দাম দিয়ে খেতে যাবে? যদিও সবাই এটা মানতে নারাজ প্রকৃত চা-প্রেমী বা চা-এর যাঁদের নেশা আছে তাঁরা কিন্তু আজও লালবাজারের চায়ের দোকানগুলিতে গিয়ে ভালো দার্জিলিং বা অসম চা-এর খোঁজ করেন, বিশেষত পাতা চা। তাঁদের কাছে এইসব ডুবিয়ে খাওয়া চা বাতিলের তালিকায় রয়েছে। এক্ষেত্রে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন অবশ্যই চা খাওয়ার সময়। বাঙালির কাছে চা বর্তমানে এমন এক পানীয় যা শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা, এমনকী মাঝরাতে বা লাঞ্চের পরেও কেউ কেউ একটু চা-খেতে পছন্দ করেন। ফলে অনায়াসে একথা বলাই যায় চা খাওয়ার এখন আর নির্দিষ্ট কোনও সময় নেই। তবে সময়ভেদে অবশ্যই চা-এর প্রকারভেদ ঘটে। অনেকের কাছে সকালের চা-টাই সারাদিনের অনুপ্রেরণা। সকালের চা-টা খারাপ হলে মনে হয় যেন সারাটা দিনই খারাপ যাবে। এ তো গেল বাড়ির চা-এর কথা, এছাড়াও কর্মব্যস্ত জীবনে চা-খাওয়ার বেশিরভাগটাই ঘটে বাড়ির বাইরে। সেটা অফিসের সামনের চা-এর দোকান হতে পারে বা একটু বন্ধুদের নিয়ে সময় করে কফি হাউস বা একটু খরচ বেশি করতে চাইলে ক্যাফে কফি ডে (সিসিডি) বা বারিস্তা-তে গিয়েও চা খাওয়া যেতে পারে। সকালে উঠেই কোনওমতে অফিস ছুটতে হলে আর বাড়িতে চা-এর স্বাদ কীভাবে পাওয়া যাবে? তাই অফিসে কাজের ফাঁকে পাশের ক্যাফেটেরিয়াতেই একটু কফিতে চুমুক দেওয়াই শ্রেয়। তবে একথা কিন্তু অনস্বীকার্য বাড়ি হোক, পাড়ার চায়ের দোকান হোক বা সিসিডি হোক চা কিন্তু বাঙালির চাই। চা খান না এমন বাঙালি খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। আর অত্যাবশ্যকীয় এই পানীয় সময়, কর্মজীবন ও পরিস্থিতি ভেদে তার চরিত্র ও কোয়ালিটি বদলাচ্ছে। একই সঙ্গে বদলে যাচ্ছে চা-এর দোকানের আড্ডাগুলোও।

সময়ের সাথে যেভাবে সমস্ত কিছু বদলে যাচ্ছে সেভাবেই চা-এর নেশাও বদলে যাচ্ছে। একই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বদলাচ্ছে পরিবারে চা পিপাসু মানুষগুলোর চরিত্র। সকালে স্ত্রী-র হাতে বানানো এককাপ চা খেয়ে স্বামীর ঘুম ভাঙত। এখন নববধূরা নিজেরাও চা বিশেষ পছন্দ করেন না। আর স্বামীর জন্যে বানানোটা অনেক ক্ষেত্রে বাতুলতা। আবার অনেক ক্ষেত্রে স্বামীর ঘুম ভাঙার আগেই স্ত্রী অফিসের ব্যাগ নিয়ে হয়তো বা অফিসের পথে অর্ধেক রাস্তা পৌঁছে গেছেন। একান্নবর্তী পরিবারে সকালে একসাথে বসে খাওয়ার যে রেওয়াজ তাও কার্যত এখন ইতিহাস। ফলে চা-এর চরিত্র বদলের সাথে সাথে চা-এর পারিবারিক অবস্থান বা বন্ধনটাও কোথায় হারিয়ে গেছে। চা রসিকরা এক্ষেত্রে বলতেই পারেন লেমন টি, জিনজার টি বা গ্রিন টি-র পক্ষে সম্ভব না এই বন্ধন ধরে রাখা। এর জন্য দার্জিলিং চা-এর সেই ফ্লেভার প্রয়োজন, যা রান্নাঘরে তৈরি হলে সারাবাড়িতে এমন সুগন্ধ ছড়াবে যাতে পুরো পরিবার এক জায়গায় বসে চা-এর জন্য অপেক্ষা করবে।

তবে এসবের পরেও বলতে হবে, চা তার স্বভাব চরিত্র পরিবর্তন করলেও গুণাগুণের দিক থেকে সে কিন্তু আজও অপরিবর্তনীয়। স্বাস্থ্যের জন্য এখনও চা যথেষ্ট উপকারী। তবে এ নিয়ে কিছু বিভ্রান্তি আছে। এক এক গবেষণার এক-একরকম রিপোর্ট প্রকাশিত হয়, আবার তা নানাসময় খবর বা বিজ্ঞাপন আকারে সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিতও হয়। যার ফলে বিভ্রান্তি তৈরি হতে বাধ্য। তবে তা যে এক আইডেনটিটি সেটা কিন্তু একপ্রকার বলাই যায়। পাড়ার চায়ের দোকানদার বলে দিতে পারেন কার ডায়াবেটিস আছে বা কে বেশি চিনি খেতে পছন্দ করেন। কেউ আবার বন্ধুদের সাথে দোকানে গিয়ে প্রতিদিন চা-এ দুধ বেশি দিতে বলে। প্রতিদিন এভাবে বলতে বলতে তা এমনই এত পরিচিতি তৈরি হয়ে যায় একসময় চা-দোকানি তার নাম ভুলে গেলেও কখনও বলে বসেন ওই যে ওই ছেলেটা যে বেশি দুধ দিয়ে চা খায়...। সব মিলিয়ে এটা অবশ্যই বলা যায় চা-এর ঐতিহ্য কিছুটা কমলেও, তা অবশ্য নামমাত্র। চা-প্রেমীরা তাঁদের চা-প্রেম অটুট রাখলে তা অবশ্যই অক্ষুণ্ণ থাকবে।

যুগশঙ্খ
SUPPLI
সোমবার, ২১ আগস্ট ২০১৭



বনেদিবাড়ির পুজো @ কলকাতা

# বনেদিয়ানা ও আভিজাত্যে উজ্জ্বল বেহালার রায়বাড়ির পুজো

**বিপাশা চক্রবর্তী**

ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, আভিজাত্য ও বনেদিয়ানার এক মেলবন্ধন বেহালার রায়বাড়ির দুর্গাপুজো। এখনও রীতি-নীতি ও নিষ্ঠাভরে পুজো হয় এই বাড়িতে। রায় বাড়ির প্রত্যেক পরতে পরতেই বনেদিয়ানার ছাপ স্পষ্ট। বিশাল বড় গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকে বড় সাদা বাড়ি ও সামনেই রয়েছে সুসজ্জিত ফোয়ারা। মা দুর্গা এখানে ডাকের সাজে সজ্জিতা হন। রায় পরিবারের ঠাকুর দালানে এই পুজোর আয়োজন করা হয়। পুজোর কিছু বিশেষ রীতি-নীতি রয়েছে। বেহালার রায় বাড়িতে দুর্গার বাহন ঠিক সিংহ কিন্তু দেখতে একটু অন্য রকম। দুর্গার বাহন সাদা রঙের। এই ধরনের সিংহকে 'দেবসিংহ' বলা হয়। দুর্গা প্রতিমা গঙ্গার ঘাটে নিরঞ্জন করা হয় না, প্রতিমা বিসর্জন হয় বাড়ির পেছনের পুকুরে। নিরঞ্জনের পর ঘটের ডাব পুরোহিত বাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠের হাতে তুলে দেন। এরপর হাত ঘুরে ঘটের ডাব বাড়ির কনিষ্ঠতম সদস্যের হাতে পৌঁছায়। তিনদিন পর ওই ডাব বিসর্জন দেওয়া হয়। বাড়ির প্রত্যেক সদস্যই পুজোর সময় বাড়িতে উপস্থিত থাকেন। রায়বাড়ির পুজোয় নানা রকম ভোগের আয়োজন করা হয়।



পুজোর ক'দিন বাড়ির সদস্যরা নির্দিষ্ট পোশাক পরিধান করেন। নতুন ডিজাইনের লাল পেড়ে গরদ আর ধাক্কা পাড়ের লুটোনো ধুতি-পাঞ্জাবিতে সাজা জমিদার বাড়ির এক আভিজাত্য বলা যেতে পারে।

রায়বাড়ির ইতিহাস বলতে সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার থেকে শুরু করতে হয়। মোঘল সম্রাট জাহাঙ্গিরের আদি সপ্তগ্রাম রাজধানীতে খাজাঞ্চি ছিলেন বেহালা রায় পরিবারের আদিপুরুষ গজেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। মোঘল সম্রাটের কাছ থেকে রাজা ও রায়চৌধুরী উপাধি প্রাপ্তি। সতেরো শতকের গোড়ার দিকে, গজেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় সম্মানিক হিসাবে 'রায়চৌধুরী' উপাধি গ্রহণ করেন।

জাহাঙ্গির তাঁর রাজধানী আদি সপ্তগ্রাম থেকে পূর্ববঙ্গে সরিয়ে নিলেও সেখানে যাননি রাজা গজেন্দ্রনারায়ণ। হালিশহর ও পরে উত্তর চব্বিশ পরগণার মধ্যমগ্রামে থাকতে শুরু করেন তিনি। এখানেই গজেন্দ্রনারায়ণ রায় এবং তাঁর বংশধররা তাদের বার্ষিক দুর্গাপুজো এবং দেবী অন্নপূর্ণা পুজো শুরু করেন। একই সঙ্গে ঈশ্বর নারায়ণ-এর পুজো শুরু হয়, যা 'নারায়ণ শিলা' নামে পরবর্তীকালে পরিচিতি লাভ করে।

১৭৪২ সাল। এই সময় বর্গিদের আক্রমণে বাংলা তখন উত্তপ্ত। রায় পরিবার তাদের প্রতিষ্ঠিত দেবতা নারায়ণ শিলা নিয়ে সেই জায়গা ত্যাগ করে। রায়চৌধুরী পরিবার চলে আসে কলকাতার উপকণ্ঠে বেহালায়। ১৭৫৬ থেকে এখানেই পুজোর আয়োজন শুরু হয়। এই পরিবারের অন্যতম কৃতিপুরুষ রায়বাহাদুর অম্বিকাচরণ রায়। পারিবারিক দুর্গাপুজো চালু রাখতে নিজের বিপুল সম্পত্তির একটি বড় অংশ শ্রীশ্রীদুর্গামাতা ঠাকুরাণীর নামে ট্রাস্ট করে দেন। তাঁর এক ছেলে অমরেন্দ্রনাথ রায়ের বেহালার বাড়িতেই এখন পুজোর আয়োজন করা হয়। দীর্ঘ কয়েক প্রজন্ম ধরে রায়বাড়িতে দুর্গাপুজোর প্রচলন রয়েছে। আজও বনেদি বাড়ির পুজোগুলির মধ্যে রায়বাড়ির পুজো অন্যতম। রায় পরিবার বেহালাতেই ১৭৫৬ সালে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পুনরায় দেবী দুর্গার পুজো শুরু হয় যা এখনও চলছে। মাঝখানে শরিকি বিবাদের জন্য পুজো বন্ধ হয়ে গেলেও ফের এই পুজো শুরু হয়।

রায় পরিবারে পুজোর সময় একটি বিশেষ রীতি প্রচলিত আছে। পুজোর সব কার্যাবলি এবং রীতি-নীতি একটি খাতায় লিপিবদ্ধ করা হয়। যা খেরোর খাতা নামে পরিচিত। এতে জন্মাষ্টমী থেকে বিজয়া দশমী পর্যন্ত সকল হিসাব-নিকাশ এবং কার্যাবলি নথিভুক্ত করা হয়। পুজো ঘিরে আরও একটি অভিনবত্ব হল, পূর্ববর্তী প্রজন্ম থেকেই তাদের মধ্যে একটি রীতি প্রচলন ছিল, সেটি হল শিউলি গাছের নীচে নতুন শাড়ি রেখে সারারাত শিউলি ফুল সংগ্রহ করা হতো। পুজোর দিনগুলোতে এই সতেজ ফুলগুলি মায়ের কাছে নিবেদন করা হত। প্রায় জন্মাষ্টমী থেকেই শুরু হয়ে যায় পুজোর তোড়জোড়।

রায় পরিবারের রীতি অনুযায়ী কাঠামো তৈরির কাজ নির্দিষ্ট দিনে শুরু হয়। কাঠামোতে মাটি লাগানোর কাজ জন্মাষ্টমী থেকেই শুরু হয়। এই দিনে কাঠামোকে বিশেষভাবে পুজো করা হয়, যা কাঠামো পুজো নামে পরিচিত। জন্মাষ্টমীর দিন কাঠামো পুজো হয়। মহালয়ার পরদিন, অর্থাৎ, প্রতিপদ থেকে ষষ্ঠীর দিন সকাল পর্যন্ত চলে চণ্ডীপাঠ। নারায়ণ পুজো। দেবী দুর্গা ও তাঁর চার সন্তান রায়বাড়িতে একচালায় সজ্জিত হন।

ষষ্ঠীর দিন সন্ধ্যা থেকেই এখানে পুজো শুরু হয়ে যায়। সকল ধর্মীয় প্রথা অনুযায়ী সপ্তমী, অষ্টমী, নবমীর পুজো হয়। এই পরিবারে কুমারী পুজোর প্রচলন আছে। অষ্টমীর দিন কুমারী পুজো হয়। প্রাণপ্রতিষ্ঠার পর মা দুর্গাকে লাল শাড়ি, সিঁদুর এবং আলতা দিয়ে রাঙিয়ে তোলা হয়। রায় পরিবারে বলিদান প্রথাও আছে। এছাড়াও পুজোর দিনগুলিতে এখানে ভোগের আয়োজন করা হয়। রায়বাড়ির পুজোয় খিচুড়ি ভোগে রয়েছে নানা বৈচিত্র। পুজোর পাঁচদিন পাঁচ রকম মাছের আয়োজন করা হয়। দশমীতে ইলিশের ঝাল, অম্বল, কচুশাক, পান্তা খাইয়ে দুর্গাকে বিদায় জানানো হয়। এখনও পুজোয় বাড়িতে ভিয়েন বসে। পুজোর পর প্রতিদিন চার হাজার চন্দ্রপুলী বিতরণ আজও এ-বাড়ির রেওয়াজ। দুর্গা এখানে ক্যাত্যায়ণী রূপে পূজিতা। কালিকাপুরাণ মতে পুজোর আয়োজন হয়। দুর্গাপুজোতেই শেষ নয়। এরপর রায় পরিবার ব্যস্ত হয়ে পড়ে জগদ্ধাত্রী পুজোর তোড়জোড়ে। দীর্ঘ এই পুজো বিজয়া দশমীর মাধ্যমে শেষ হয়। চোখের জলে মাকে বিদায়ের পর আবার রায়বাড়িতে আবারও আগমনীর দিন গোনা শুরু হয়ে যায়।

*ফোটো: লেখিকা*



রায় বাড়ির প্রত্যেক পরতে পরতেই বনেদিয়ানার ছাপ স্পষ্ট। বিশাল বড় গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকে বড় সাদা বাড়ি ও সামনেই রয়েছে সুসজ্জিত ফোয়ারা। মা দুর্গা এখানে ডাকের সাজে সজ্জিতা হন। রায় পরিবারের ঠাকুর দালানে এই পুজোর আয়োজন করা হয়।

যুগশঙ্খ
SUPPLI
সোমবার, ২১ আগস্ট ২০১৭

# দ্বিচক্রযানে কলকাতাযাপন

**বুদ্ধদেব হালদার**

উত্তর কলকাতার মধ্য দুপুরে কান পাতলে আজও শোনা যাবে সেই বহু পরিচিত টুংটাং শব্দ। নির্জনে, আড়ালে, একাকী আজও তাদের অবাধ চলাচল এপাড়া থেকে ওপাড়ায়। এই তিলোত্তমা শহরে একশো তিন বছরের জীবন্ত জীবাশ্ম হয়ে বহাল তবিয়তে এখনও তাদের এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায় অবলীলায়। শুধুমাত্র ভিক্টোরিয়ার স্থাপত্য বা হাওড়া ব্রিজের রাতদৃশ্য নয়, ট্যুরিস্টরা এই ঐতিহ্যবাহী কলকাতা শহরে এসে আজও মরিয়া হয়ে খোঁজেন সেই দ্বিচক্রযান 'টাঙা' বা হাতে টানা রিকশা। একবার হলেও তারা শহর কলকাতার 'টাঙা' চড়ে আলস্যে গা দুলিয়ে বেরিয়ে পড়েন নিয়ন আলোয় রাতের কলকাতা দেখতে। ভারতের বাইরে থেকে ঘুরতে আসা ট্যুরিস্টদের কাছে তাই কলকাতার হাতেটানা রিকশা আজও একটি তীব্র আকর্ষণের বিষয়। পৃথিবীর আর কোনও দেশে অবশ্য এই হাতেটানা রিকশার কোনও অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না এখন। শুধু অন্য দেশেই-বা কেন বলছি, খোদ কলকাতা ছাড়া ভারতের আর কোনও শহরে এই 'টাঙা' আজ আর দেখতে পাওয়া যায় না। তবে, কলকাতা মরতে মরতেও বেঁচে থাকে। কলকাতা বেঁচে থাকে তার নিশ্বাসে, যে নিশ্বাসে মিশে আছে বাঙালির ঐতিহ্য। কলকাতা আজও তার সংস্কৃতিকে লালন করে চলেছে নিজের হৃদয়ের মলিন উত্তাপে। তাই হয়তো ঘোড়ার গাড়ি, ট্রাম বা রসোগোল্লা যেমন এই শহরের প্রাচীন ঐতিহ্য, ঠিক তেমনি এই 'টাঙা'ও আমাদের প্রাচীন কলকাতার ঐতিহ্যকে আজও বহন করে নিয়ে চলেছে। কলকাতা শহর ঘুরে দেখলেই বোঝা যাবে এখনও শহরের এখানে-সেখানে টাঙা চলছে। বিশেষ করে নিউ মার্কেটের পাশেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় সারি সারি হাতে টানা রিকশা। এছাড়া মার্কুইস স্ট্রিট, পার্ক স্ট্রিট, কলেজ স্ট্রিটের বিভিন্ন জায়গায় খুব সহজেই আমাদের চোখে পড়ে যাবে এই দ্বিচক্র যান।



বিশিষ্ট লেখক ডোমেনিক ল্যাপিইয়ারের লেখা 'সিটি অব জয়' বইটি থেকে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের কলকাতার রিকশা ও রিকশাওয়ালার জীবনকাহিনি খুব সুন্দরভাবেই উঠে এসেছে। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দশকে এই টাঙার যে বিবরণ পাওয়া যায় তা আজকের টাঙার সঙ্গেও গঠনগত হুবহু মিলে যায়। এই হাতেটানা রিকশার প্রধান আকর্ষণ এর কাঠের তৈরি চাকা। এই চাকার মাঝখানের অংশটা যথারীতি লোহা দিয়ে বেড়ি পরানো থাকত। আর রিকশার চাকাটি খুব উচ্চমানের কাঠ দিয়ে তৈরি হত। যেহেতু শহরের খানাখন্দে ভরা রাস্তায় বর্ষা, গ্রীষ্ম কিংবা শীত যে কোনও ঋতুতেই সওয়ারিকে বসিয়ে গড়গড়িয়ে নিয়ে যেতে হয় বাহককে। তাই যাকে তাকে দিয়ে টাঙা তৈরি করতে দেওয়া হয় না, সে-যুগে ওস্তাদ কারিগররা বিশ্বকর্মার নাম নিয়ে এই টাঙা তৈরিতে হাত দিতেন। এখন অবশ্য হাতেগোনা সেই কারিগরের সংখ্যা। এই রিকশার আরেকটি বিশেষ আকর্ষণ এর বসবার গদি। সেসময় খড় বা নারকোলের ছোবরা দিয়ে এই গদি তৈরি হতো। বাইরের কভার কোনও মোটা প্লাস্টিক বা রেক্সিন কাপড় দিয়ে মুড়ে রাখা হতো। তাই, এই দ্বিচক্র যান ছিল শহরের প্রথম দূষণ-মুক্ত পরিবহন। সম্প্রতি ২০১০-এর একটি সমীক্ষা থেকে জানা যাচ্ছে, কলকাতা শহরে এখনও প্রায় আঠারো হাজার হাতেটানা রিকশা আছে।

জাপানি শব্দ 'জিন্রিকিশা' থেকে বাংলায় 'রিকশা' শব্দটি এসেছে। বাংলায় ওই শব্দটির অর্থ আদম চালিত বাহন। প্রথম রিকশা আবিষ্কারকের নাম ও স্থান নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। তবুও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ঘেঁটে বিষয়টা খুঁজে বের করতে খুব একটা অসুবিধা হয় না। অনেকে মনে করেন ফরাসি রাজা চতুর্দশ লুই (১৬৩৮-১৭১৫) সর্বপ্রথম আদম চালিত ভ্রাম্যমাণ কেদারার প্রচলন করেছিলেন ১৭ শতকে। বলাই বাহুল্য ওটিই হল প্রাচীন রিকশার ফর্ম। আবার অ্যালবার্ট টলম্যান নামের এক আমেরিকান কামারকে বলা হয়ে থাকে প্রথম রিকশা তৈরির কারিগর। তিনি ১৮৪৮ সালে প্রথম রিকশা তৈরি করেছিলেন বলে জানা যায়। আবার 'সাময়িক পত্র' পত্রিকা থেকে জানা যায়, জোনাথান স্কোবি নামের এক আমেরিকান মিশনারিকে ১৮৬৯-এর গোড়ার দিকে স্ব-উদ্ভাবিত রিকশাতে বসিয়ে নিজের পঙ্গু স্ত্রীকে নিয়ে জাপানের ইয়োকহামা শহরে প্রথম ঘুরতে দেখা গেছে। তবে নিউ জার্সির 'দ্য বার্লিংটন কাউন্টি হিস্টোরিক্যাল সোসাইটি' নামক জাদুঘর থেকে যে তথ্য সামনে আসছে তা হল ইয়োসুক, টকুজিরো এবং কসুকে এই তিন জাপানি ঘোড়াগাড়ি নির্মাতা ১৮৬৭ সালে প্রথম দু'চাকার হাতেটানা রিকশা তৈরি করেছিলেন। অনেক গবেষণার মাধ্যমে পণ্ডিতরা এটা মেনে নিয়েছেন যে ১৮৬০ থেকে ১৮৭০ সালের ভিতর জাপানই প্রথম রিকশা তৈরি করে। পণ্য পরিবহনের কাজের জন্য রিকশার মারাত্মক চাহিদা ওই সময় সেসব দেশে ক্রমশই বাড়তে থাকে। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের পর যন্ত্র প্রযুক্তির ব্যাপক উৎকর্ষের দরুন ১৯৩০ সালের আগেই জাপানে এবং ১৯২৫-এর পরপরই চিনে রিকশার প্রচলন হঠাৎ করেই কমতে থাকে। মোটর গাড়ি আর ট্রেনের আগমন রিকশার জনপ্রিয়তাকে একেবারেই ধুলোয় মিলিয়ে দেয়। অবশ্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পেট্রোলের দাম বেড়ে যাওয়ায় পুনরায় রিকশার কদর বেড়ে গিয়েছিল।

১৯৩০ সালের আগেই জাপানে এবং ১৯২৫-এর পরপরই চিনে রিকশার প্রচলন হঠাৎ করেই কমতে থাকে। মোটর গাড়ি আর ট্রেনের আগমন রিকশার জনপ্রিয়তাকে একেবারেই ধুলোয় মিলিয়ে দেয়। অবশ্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পেট্রোলের দাম বেড়ে যাওয়ায় পুনরায় রিকশার কদর বেড়ে গিয়েছিল।

চিনা বণিকদের হাত ধরেই প্রথম ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে ভারতের হিমাচল প্রদেশের সিমলায় রিকশার ব্যবহার চালু হয়েছিল এবং সেখান থেকে হাতে টানা রিকশা চলে আসে তিলোত্তমা কলকাতায়। ঘটনাটি ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের গোড়ার দিকের কথা। প্রথম দিকে শুধুমাত্র পণ্য পরিবহণের কাজেই রিকশা ব্যবহার করা হতো। মূলত চিনা বণিক ও ইংরেজরা নিজেদের কাজে সে-সব ব্যবহার করতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু ১৯১৪ সাল নাগাদ কলকাতায় ভাড়াটে রিকশার চল শুরু হয়ে যায়। সরকারের অনুমতি নিয়ে চিনা বণিকরাই সে ব্যবস্থা আদায় করে নিয়েছিলেন। সে-সময়ের কলকাতার মানুষের মধ্যে এই হাতেটানা রিকশায় চড়ে ঘুরে বেড়ানোর মধ্যে একটা বিলাসিতা লক্ষ করা যেত। শোনা যায়, শোভাবাজারের রক্ষিতারাও সপ্তাহে একদিন রিকশা করে ঘুরতে বেরোতেন কলকাতার রাস্তায়। সেসব অবশ্য বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের ঘটনা। বিখ্যাত কথা সাহিত্যিক বনফুলের গল্পে এ প্রসঙ্গ আমরা বহুবার লক্ষ করতে পারি। বিশেষ করে আগেকার দিনে এই টাঙায় চড়ে রাতের কলকাতা দেখার যে গ্ল্যামারাস ব্যাপার বাঙালিদের মধ্যে ছিল সেটা অবশ্য এই সময়ে আর খুব একটা খুঁজে পাওয়া যায় না। এই হাতেটানা রিকশা নিয়ে রোম্যান্টিকতারও কোনও শেষ নেই। ১৯৫৩ সালে নির্মিত বিমল রায়ের 'দো বিঘা জামিন' সিনেমাটির কথা হয়তো এখনও অনেক মানুষেরই মনে পড়ে যাবে। ছবিটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটি রিকশাকে নিয়েই গল্প এগিয়ে গেছে। গ্রাম থেকে শহরে জীবিকার সন্ধানে আসা এক যুবক কীভাবে রিকশাকে নিজের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে নিলেন, তা নিয়ে এই সিনেমা। ক্লাইম্যাক্সের সিনটা আজও অনেকের চোখকে পলকে চমকে দিতে পারে। হাতেটানা দুটো রিকশার মধ্যে রেষারেষি কীসের প্রতীক? বেঁচে থাকার। অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশরা রিকশার যে গঠন তৈরি করেছিলেন ১৯৫০ সালে তা একটি নির্দিষ্ট চেহারা পায়। বলাই বাহুল্য কোনওরকম পরিবর্তন ছাড়াই সে রিকশা এই ওয়াই টুকে ২০১৭ তেও উত্তর কলকাতার ওলিগলিতে খুঁজে পাওয়া যাবে। কলকাতা থেকে ১৯৩০-এর দিকে ঢাকায় প্রথম রিকশা আনা হয়। ১৯৩৮ সালে নিজেদের প্রয়োজনে ধলা চামড়ার পাট ব্যবসায়ীরা তাঁদের ব্যবসাকেন্দ্র নারায়ণগঞ্জ আর নেত্রকোণায় কলকাতার রিকশা নিয়ে গিয়ে ব্যবহার শুরু করেন। বাংলাদেশে এই টাঙার প্রচলন অনেকটাই দেরি করে হয় আর তা অবশ্যই কলকাতা মারফত। কলকাতার হাতেটানা রিকশার কোনও গঠনগত পরিবর্তন লক্ষ না করা গেলেও, কলকাতার পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন অঞ্চলে ও মফস্সলে কিন্তু তিন চাকার রিকশা খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এক দশক আগেও তার চল ছিল। এখন অবশ্য ব্যাটারিচালিত রিকশা গ্রামে-গঞ্জে দেখা যাচ্ছে। অনেকে এই রিকশার নাম দিয়েছেন 'তুফানি রিকশা'। এগুলি ইঞ্জিনচালিত। ফলে খুব একটা পরিশ্রম করতে হয় না চালককে। তবে উত্তর আধুনিক প্রযুক্তিতে ভর করে এই ধরনের তিন চাকার ইঞ্জিনচালিত রিকশা বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে কম-বেশি দেখা গেলেও আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য কিন্তু ওই দু-চাকার টাঙাতেই।

ডারউইন স্যার আমাদের বহু আগেই বলে গেছেন প্রাকৃতিক নির্বাচনবাদ ও যোগ্যতমের উদবর্তনের কথা। সেদিক থেকে ভেবে দেখলে টাঙা বা হাতে টানা রিকশার ব্যবহার দিন দিন আরও কমে আসছে আমাদের এই খোদ কলকাতা শহরেই। তার অবশ্য অনেক কারণ আছে। টাঙার ৬৮ বছরের এক চালকের (রাহেশ রামপাল, শিয়ালদহ) কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল এই কাজে তরুণরা কেন এত উদাসীন। তিনি তাঁর ভাষায় স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, 'আমাদের খুব বেশি রোজগার আসে না এই রিকশা চালিয়ে। আর যা পাই, তার থেকে সর্দারকে দিয়ে দিতে হয় বেশিরভাগ রোজগারটাই। আর তাছাড়া এখন আর কেউ টাঙায় চড়ে না। আমরা তো লেবারদের মাল নিয়ে যাই-আসি এখন টাঙাতে, মানুষ কোথায় আর চড়ে বাবুসাব।' এই বাইট থেকে কিছুটা হলেও বোঝা যাবে টাঙার ব্যবহার কমে আসার কারণ। মূলত রোজগার না হওয়া। তাছাড়া এখন আর কাজের বাইরে কে-ই-বা শখে টাঙা চড়বে নেহাত প্রয়োজন না পড়লে। আফ্রিকার মাদাগাস্কারে ঠিক এই কারণেই গত শতাব্দীর গোড়ার দিকে টাঙা বন্ধ হয়ে যায়। চিনা কমিউনিস্ট পার্টি প্রধান মাও জে দং ১৯৪৯ সালে রিকশার ভেতরে পুঁজিবাদ তথা শ্রেণি বৈষম্যের গন্ধ পেয়েছিলেন। তাঁর ব্যাখ্যা হল, যে রিকশায় চড়ছে সে বুর্জোয়া আর যে রিকশা টানছে সে প্রতারিত। এই বৈষম্যের বয়ান চিনে রিকশাকে দ্রুতই জনপ্রিয়তার বিপরীতে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দেয়। পশ্চিমি মানবাধিকার সংস্থাগুলো এশিয়ার বিভিন্ন দেশে চলমান এই বাহনকে 'অমানবিক' ব্যাখ্যা দিয়ে তা বন্ধের জন্য চাপ দিতে থাকে। ১৯৬০ সালে পাকিস্তান সরকার ওই পশ্চিমি ব্যাখ্যাকেই সামনে এনে রিকশা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কলকাতায় বামফ্রন্ট সরকারের আমলেই এই বাহনকে 'অমানবিক' আখ্যা দিয়ে টাঙা বন্ধ করার নোটিশ জারি হয়েছিল। তার বদলে তারা ওই বাহকদের হাতে 'গ্রিন রিকশা' তুলে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। পরবর্তী সরকার আসার পর দেখা যায় সে বিষয়ে কড়াকড়ি কোনও পদক্ষেপ তাঁরা নিলেন না। ফলে, আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এখনও খোশ মেজাজেই কলকাতার অলিগলিতে চলছে টাঙা।

আজও উত্তর কলকাতার বহু বয়স্ক মানুষ টাঙাকেই তাঁদের ফার্স্ট চয়েস মনে করেন। কারণ হিসাবে তাঁরা বলেন, এটা তাঁদের কাছে একেবারে হ্যাজল-ফ্রি। এছাড়া অনেক বনেদি পরিবারের বাচ্চা ছেলেমেয়েরা আজও টাঙাতে চড়েই স্কুলে যায়। কারণ, বর্ষাকালে এটাই একমাত্র আশা-ভরসা হলেও একদিন আমাদের চোখের সামনেই এই টাঙা দেখতে দেখতে হারিয়ে যাবে আমাদের দিনযাপনের ছায়া থেকে। সেদিন এসব নিয়ে আমাদের আর কারওর কোনও মাথাব্যথাও থাকবে না। কিন্তু পুরনো সাদাকালো অ্যালবাম মনে করিয়ে দেবে দু'চাকার একটা যান কলকাতার ঐতিহ্যকে বয়ে নিয়ে গিয়েছিল দীর্ঘ এক শতকেরও বেশি সময় ধরে। তার সঠিক দাম কি আমরা ওই বাহকদের দিতে পেরেছি কোনও দিনও?

*ফোটো: সুজয় চট্টোপাধ্যায়*

# পূর্ণিমার রাতে ভেসে আসে ঘুঙুরের শব্দ

**সোমনাথ আদক ও তন্ময় মণ্ডল**

কথায় বলে, কৌতূহলের পালে হাওয়া লাগলে বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইতে থাকে সাহসিকতা। ভয়ও তখন ভয় পায় আপাত দুঃসাহসী হয়ে ওঠা গা শিরশিরে কাহিনিগুলোকে। রহস্য হয়ে ওঠে পাখির চোখ। শুরু হয় উত্তর খোঁজা— অদৃশ্য, অলৌকিক, কাল্পনিক অবয়ব বলতে আদতে কি আছে? নাকি পুরোটাই রটনা!

শোভাবাজার জেটির কাছে হরচন্দ্র মল্লিক লেনের বাড়িটাকে ঘিরে কথিত আছে এমনি এক রহস্য। The City of Joy-এর বুকে রাত নামলেই নাকি ধীরে ধীরে তার রূপ পালটাতে শুরু করে উত্তর কলকাতার বারো শরিকের এই বাড়িটা। হয়ে ওঠে হানাবাড়ি। ঘরের ভেতরে, অন্ধকারে জ্বলে ওঠে ঝাড়বাতি। হুগলি নদীর ছলাৎ ছলাৎ ঢেউয়ের শব্দকে ছাপিয়ে ভেসে আসে কার যেন সুরেলা কণ্ঠস্বর। দেওয়ালে দেওয়ালে প্রতিধ্বনিত হয় ঘুঙুরের আওয়াজ। তারপরেই তিনতলার কোনও এক অন্ধকার ঘর থেকে ভেসে আসে কান্নার আওয়াজ। মৈথুনরত কোনও রমণীর তীব্র শীৎকার। এ কি শুধুই মনের ভুল? নাকি হুগলি নদীর বহতা স্রোত ইতিহাসের পাতা থেকে ভাসিয়ে নিয়ে আসতে চায় আহিরিটোলার এই জমিদারি প্রাসাদ ভবনের কোনও করুণ কাহিনি! —সে প্রশ্নই প্রতিটা নোনাধরা ইটের খাঁজে, কুষ্ঠরোগীর মতো প্লাস্টার খসে যাওয়া দেওয়ালের গায়ে।

জমিদারি প্রথা বিলোপ হয়েছে। স্বাধীন হয়েছে ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারত। তারপরেও গঙ্গার এই শাখানদী দিয়ে বয়ে গেছে অনেক জল। বয়স বেড়েছে শহরের। বয়স বেড়েছে প্রাসাদোপম এই বাড়িটারও। কালের প্রবাহে কলকাতা হয়েছে কল্লোলিনী তিলোত্তমা। আর বাড়িটা ক্রমশ হয়েছে জেল্লাহীন। তার শরীর থেকে খসে গেছে প্লাস্টার। ভেঙে যাওয়া দাঁতের মত লোনা ধরে ফোকলা হয়েছে ইট। কিন্তু বাড়িটা এমন ছিল না আগে। সোনালি অতীতে খাঁটি রোমান স্থাপত্যের স্বর্গীয় সৌন্দর্য নিয়ে যে কোনও প্রাসাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে পারত এই বাড়ি। এই বহুতলের সর্বাঙ্গ সাজানো ছিল বিভিন্ন রকম পুতুলের মূর্তিতে। বাড়ির অঙ্গসজ্জায় প্রতিপদে বিচ্ছুরিত হতো প্রাচীন রোমান শিল্পকলা। কে বা কবে এই বাড়ি তৈরি করেছিল ইতিহাস তার সুস্পষ্ট কোনও প্রমাণ দিতে না পারলেও কী উদ্দেশ্যে বাড়িটা তৈরি হয়েছিল— তা নিয়ে মোটামুটি একমত কলকাতার বিশেষজ্ঞ মহল।

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে গঙ্গার পাশের এই অট্টালিকার মালিকানা ছিল ধনাঢ্য বাবুদের। এটা ছিল বাবুদের প্রমোদ ভবন। জুড়িগাড়ি, পালকি এমনকী পানসিতেও এখানে ভিড় করতেন জমিদার ও বিত্তবান পুরুষেরা। এখানেই বসত মজলিস। জ্বলে উঠত হাজার বাতির রোশনাই। রাত যত বাড়ত রং চড়ত আসরে। বেজে উঠত বাইজির ঘুঙুর। সুরেলা গলার সুর এ-বাড়ি ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ত বাতাসে। ভেসে বেড়াত ছলাৎ ছলাৎ নদীর জলে। শুধু বাইজি নয়। কথিত আছে, গরীব পরিবার থেকে লুঠ করে আনা হতো মহিলাদের। এমনকী বাদ যায়নি বাড়ির কাজের মহিলারাও। তারপর সেইসব মহিলাদের ওপর বিকৃত-কাম বাবুদের যৌন নির্যাতন চলত। নির্মম শারীরিক অত্যাচার। মুখ বুজে সে সব সহ্য করতে না পারলে অনেক সময়ই মেরে ফেলা হতো তাদের। শোনা যায়, নাচের সময় খুন করা হয় এক বাইজিকেও। মৃত্যুর আগে নির্মমভাবে নির্যাতিতা নারীদের চিৎকার ও বাঁচার আকুতি নাকি আজও প্রাসাদোপম এই বাড়ির দেওয়ালে দেওয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়।

শোনা যায়, আহিরিটোলার বিশাল এই বাড়িতে সন্ধ্যার পর নাকি দোতলা বা তিনতলায় ওঠার সাহস পান না কেউই। রাত নামলেই বহু বছরের প্রাচীন এই বাড়িটি হয়ে ওঠে The Ghost House। জীবন্ত হয়ে ওঠে সেই সব অতৃপ্ত পেত্নীর আত্মা। কথিত আছে, এবাড়ির দোতলা ও তিন তলায় দুজন নারীর পায়ের শব্দ শোনা যায়। অনেকেই শুনেছেন তাদের ফিসফিস কথার আওয়াজ। গভীর রাতে বাঁচার আকুতি নিয়ে নারীর কান্নার শব্দও যে কারও বুকে কাঁপন ধরিয়ে দেয় তা বলাই বাহুল্য। নৃত্যরত যে বাইজিকে এখানে খুন করা হয়েছিল, তার আত্মাও নাকি ঘুরে বেড়ায় এই বাড়িতে। প্রতি পূর্ণিমার রাতে নাকি শোনা যায় তার ঘুঙুরের আওয়াজ। সেই নর্তকী নাকি জ্যোৎস্না রাতে নাচে পুতুলবাড়ির নাচঘরে। তখন জীবন্ত হয়ে ওঠে সাজানো পুতুলগুলো। তারপর আবছায়ার মতো এবাড়ির বারান্দায়, উপর তলার কুঠুরিতে, ছাদে হেঁটে চলে ঘুরে বেড়ায় তারা। যারা এদের দেখেছে তারা বলে ওরা আসলে পুতুলরূপী সেইসব মহিলার অতৃপ্ত আত্মা। অশরীরি অস্তিত্বে বিশ্বাসীরা অবশ্য নিশ্চিত, পুতুলবাড়ি ভৌতিক। এই বিশাল বাড়ির বেশিরভাগটাই নাকি পরিত্যক্ত। ভূতের জন্য সেই অংশে পা রাখতে পারেন না বাড়ির বাসিন্দারাও। হয়তো হতেও পারে তারা ওই ছায়ামানুষ বা না মানুষদের সম্ভাবনা নিয়েই বেশি স্বচ্ছন্দ্য। বরং ভূত-সাক্ষাৎ প্রার্থীদের আচমকা আগমনই তাদের কাছে অবাঞ্ছিত।

আসলে বঞ্চনা, নির্যাতন আর ভৌতিক রহস্যে ঘিরে থাকা এই বাড়িকে নিয়ে আজও যেমন মানুষের কৌতূহলের সীমা নেই তেমন ভূত-উৎসাহীদের উপদ্রবেরও শেষ নেই। তাই নোটিশ পড়েছে পুতুলবাড়ির দরজায়— 'ভূত দর্শনের জন্য এ-বাড়িতে বহিরাগতদের প্রবেশ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ'।

কলকাতা
যুগশঙ্খ SUPPLI
সোমবার, ২১ আগস্ট ২০১৭

**বিদ্যুৎ-সংক্রান্ত যে কোনও তথ্য জানতে**

ওয়েস্টবেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড (২৩৫৯১৯১৫, ২৩৩৭১১৫০)

সিইএসসি গ্রাহক পরিষেবা (২৪৭৮৪৩০২, ২৪৭৮৪৮৮৮, ২৪৭৮৪৮৮৯)

অভিযোগ:

সিইএসসি (উত্তর) ২২৩৭৩১৬১, ২২৩৭৬৪

সিইএসসি (দক্ষিণ) ২৪৬৬৪৬৪৩, ২৪৬৬৩১৬১, ২৪৬৬৩১৬২

বেহালা ডিপো (এমার্জেন্সি) ২৪৭৮১৬৭৩

কালীঘাট ডিপো (এমার্জেন্সি) ২৪৫৫৫৬০৯

আসছে পরিবর্তন বিনোদন-এ

কলকাতা

যুগশঙ্খ SUPPLI

সোমবার, ২১ আগস্ট ২০১৭

এই ক্রোড়পত্রের সমস্ত লেখার মতামতই লেখকদের নিজস্ব।



# কলকাতা শহরটাই একটা অনুভবের শহর

**জুলকার রহমান** (কবি)

মনের কোনও দেশ হয় না বলেই বিশ্বাস। ভাষার কোনও দেশ হতে পারে না বলেই আমি বিশ্বাস করি। তাই এপার বা ওপারে যতই কাঁটাতার থাকুক না কেন, তারা কোথাও না কোথাও একসূত্রে বাঁধা। আমার কাছে কলকাতা আর ঢাকা হৃদপিণ্ডের দুটো অলিন্দ। সাহিত্যের যেমন কোনও সীমারেখা নেই, তেমনি সাহিত্যিকদেরও নেই। কলকাতা বাংলা সাহিত্যের রাজধানী এ-কথা অনেকেই স্বীকার করেন। সত্যি বলতে কী ওই জন্যই মূলত এই শহরটার প্রতি আমার এত টান ছিল বাল্যকাল থেকে। প্রথম যখন কলকাতা যাবার পরিকল্পনা হয়েছিল, আমার মনে আছে তখন আমি খুবই ছোট। তবে কলকাতায় সেবার যাওয়া হয়ে ওঠেনি নানা কারণে।

আমার খালার বাড়ি দমদমে। দেশভাগের পর আমাদের পরিবার বাংলাদেশে চলে আসলেও, খালারা ওপারেই থেকে যান। আমি প্রথম কলকাতা যাই ২০০৯ সালের অক্টোবর মাসের দিকে। সারা কলকাতা সেজে উঠছে তখন অন্যরকম রূপে। আমি তখন কলকাতায়, দুর্গাপুজার দিন দুই বাকি। সারা শহর জুড়ে উৎসবের মরশুম। ট্রেন থেকে নামলাম। সেখানে দেখালাম গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে খালাতো ভাই সাজিদ। ওর সাথে গাড়িতে উঠে খালার বাসায় যাচ্ছি। গাড়ির জানলার কাচ দিয়ে সারা শহরটাকে এত সুন্দর লাগছে ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। আমি শুধু মন্ত্রমুগ্ধের মধ্যে দেখে চলেছি আলোর রোশনাই ঘেরা কলকাতার অনন্য রূপ। মনে হচ্ছিল সারা কলকাতা শহরটা যেন অনাবিল আনন্দে ভরে উঠেছে। এই ছিল কলকাতার সাথে প্রথম আলাপ।

প্রথমবার এই শহরটাতে আমার আসা নিছকই খালার বাড়িতে বেড়াতে। আমার দুই ভাই জুটল এখানে এসে, তারা আবার হুমায়ুন আহমেদের মারাত্মক ভক্ত। তারাই দায়িত্ব নিল কলকাতা শহরটা ঘুরে দেখানোর। আসার পরদিন ঠিক হল আমরা একটু কেনাকাটা করতে যাব। কোথায় যাব? ধর্মতলায় মেট্রো থেকে নামতেই দেখি, রাস্তা জুড়ে অগণিত মানুষের ঢল। পরের দিন পুজো। দমদমের আশপাশ থেকে শুরু করে যেখানেই যাচ্ছি সুন্দর সুন্দর প্যান্ডেল, আলোকসজ্জা অদ্ভুত সুন্দর লাগছিল। যাই হোক ধর্মতলায় মার্কেটিং সেরে আমরা ফিরলাম রাতের দিকে। পাশে এক বাড়িতে গান আর কবিতার আড্ডা বসেছিল সেখানেও যোগ দিলাম ভাইদের সাথে। এরপর পুজোর দ্বিতীয় দিনে, যখন কলকাতা গমগম করছে আমি ফিরে গেলাম দেশে। এদিক-ওদিক একটু-আধটু ঘোরা হল। পুজোর সময় বলে অনেক জায়গায় যাওয়া হল না। তবে প্রিন্সেপ ঘাট জায়গাটার সৌন্দর্য আমায় মুগ্ধ করেছিল।

এরপর কলকাতায় গেলাম একটি কবি সম্মেলনে যোগ দিতে ২০১১ সালে। তারেক হোসেন বাবলু আর আমি বাংলাদেশ থেকে প্রতিনিধিত্ব করেছিলাম। সেবার গিয়ে আর খালার বাসায় উঠিনি। ছিলাম নিউ মার্কেটের একটা হোটেলে। সম্মেলন শেষ হবার পর আরো দুটো দিন কলকাতায় ছিলাম। অনেক প্রিয় সাহিত্যিকের বাড়িতে গিয়ে সেই যে আড্ডা, আমার জীবনের পরম প্রাপ্তি। সুনীলদা বলেছিলেন, 'জুলকার বাংলাদেশের মানুষ অনেক বেশি আন্তরিক তবে কলকাতা কিন্তু ভালোবাসতে কার্পণ্য করে না।'

সেবার চিড়িয়াখানা, বিড়লা তারামণ্ডল থেকে শুরু করে জাদুঘর এমনকী কফি হাউস, বসন্ত কেবিন কিছুই বাদ দিইনি। আসলে সারা কলকাতা শহরটাই একটা অনুভবের শহর। এখানে কোনটা ছেড়ে কোনটার বর্ণনা দিই। এখনও বসন্ত কেবিন বা কফি হাউসের সেইসব স্মৃতি যখন মনে পড়ে গায়ে কাঁটা দেয়। এত ইতিহাস পড়েছি এই জায়গাগুলো নিয়ে, এত গল্প শুনেছি; সেই জায়গাগুলো সামনে থেকে দেখা সেখানে বসে কফি খাওয়া কম সৌভাগ্যের নয়। আসলে কলকাতা শহরটাই ইতিহাসের শহর। মনের ভেতর এখনও অদ্ভুত পুলক তৈরি হয় যখন কলকাতার স্মৃতি মনে পড়ে। কলকাতা আমার কাছে অনেক বেশি ভালোলাগার। অনেক বেশি আবেগের।

*ফোটো: সুজিত জানা*



# বিজ্ঞানসাধক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

**শঙ্খ রায়**

'বাঙালির ছেলে ব্যবসা করতে পারে না'— এই ধারণার সম্পূর্ণ পরিপন্থী যে-মানুষটি বিজ্ঞানে ভারতকে এক অন্য আসনে বসিয়েছিলেন; যাঁর কাজ, শ্রম, অধ্যবসায় জীবনযাত্রায় আনতে চেয়েছিল নতুন আঙ্গিক তিনিই বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র রায়। ইতিহাসের পাতায় তিনি ভারতীয় রসায়নের জনক। তিনি ছিলেন একাধারে একজন রসায়নবিদ, শিক্ষাবিদ, দার্শনিক, সমাজসংস্কারক, উদ্যোক্তা এবং দেশপ্রেমিক।

১৮৬১ সালের ২ আগস্ট বাংলাদেশের খুলনা জেলার পাইকগাছা উপজেলার রাড়ুলি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। যে-অঞ্চলে তিনি জন্মগ্রহণ করেন তার পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে সেই বিখ্যাত কপোতাক্ষ নদ। তাঁর পিতা ছিলেন স্থানীয় জমিদার হরিশচন্দ্র রায়। রাজা রামমোহন রায় কর্তৃক যে ব্রাহ্ম সমাজের উদ্ভব হয়েছিল, সেখানে প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের পিতা ছিলেন অন্যতম সংগঠক ও নিবেদিতপ্রাণ কর্মী। মাতা ভুবনমোহিনী দেবী। বনেদি পরিবারের সন্তান প্রফুল্লচন্দ্র ছেলেবেলা থেকেই সব বিষয়ে অত্যন্ত তুখোড় এবং প্রত্যুৎপন্নমতি ছিলেন।

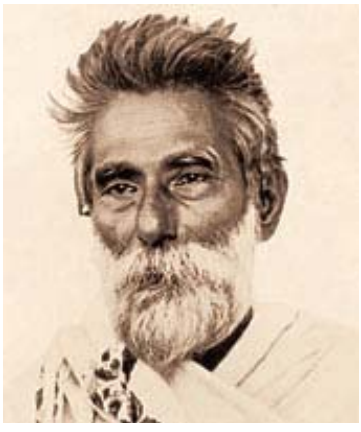

তাঁর পড়াশোনা শুরু হয় বাবার প্রতিষ্ঠিত এম.ই স্কুলে। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে তিনি কলকাতার হেয়ার স্কুলে ভর্তি হন, কিন্তু রক্ত আমাশায় রোগের কারণে তার পড়ালেখায় ব্যাপক বিঘ্নের সৃষ্টি হয়। বাধ্য হয়ে তিনি নিজের গ্রামে ফিরে যান এবং গ্রামে থাকার এই সময়টা তাঁর জীবনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসে। বাবার গ্রন্থাগারে প্রচুর বই পান তিনি এবং সেগুলি তার জ্ঞানমানসের বিকাশসাধনে প্রভূত সহযোগিতা করে। ১৮৭৯ সালের এন্ট্রান্স পাশ করবার পর তিনি কলকাতা চলে আসেন এবং বিদ্যাসাগর কলেজে ভর্তি হন। সেখানে রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞানের কোনও ব্যবহারিক ক্লাস না থাকার কারণে তিনি বহিরাগত ছাত্র হিসাবে প্রেসিডেন্সি কলেজে যান। এখানে তিনি অধ্যাপক আলেকজান্ডার পেডলারের অধীনে পড়াশোনা করেন। ১৮৮২ সালে সর্বভারতীয় উপমহাদেশের একটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ করেন। এরপর তিনি বিখ্যাত এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে যান। পরবর্তীকালে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়েই ডিএসসি ডিগ্রি লাভের জন্য গবেষণা শুরু করেন। তাঁর সেই গবেষণার বিষয় ছিল কপার ম্যাগনেসিয়াম শ্রেণির সম্মিলিত সংযুক্তি পর্যবেক্ষণ। দু'বছরের কঠোর সাধনায় তিনি এই গবেষণা সমাপ্ত করেন এবং পিএইচডি ও ডিএসসি ডিগ্রি লাভ করেন। এমনকী তাঁর এই গবেষণাপত্রটি শ্রেষ্ঠ মনোনীত হওয়ায় তাঁকে 'হোপ' প্রাইজে ভূষিত করা হয়।

ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ঘুরে ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে প্রফুল্লচন্দ্র রায় দেশে ফিরে আসেন। দেশে ফিরে প্রেসিডেন্সি কলেজের সহকারী অধ্যাপক হিসাবে তিনি তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। প্রায় ২৪ বছর তিনি এই কলেজে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। অধ্যাপনাকালে তাঁর প্রিয় বিষয় রসায়ন নিয়ে তিনি নিত্যনতুন অনেক গবেষণাও চালিয়ে যান। তাঁর উদ্যোগে তাঁর নিজস্ব গবেষণাগার থেকেই 'বেঙ্গল কেমিক্যাল কারখানা' সৃষ্টি হয় এবং পরবর্তীকালে ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে তা কলকাতার মানিকতলায় ৪৫ একর জমিতে স্থানান্তরিত করা হয়। তখন এর নতুন নাম রাখা হয় 'বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড'। ১৮৯৬ সালে তিনি একটি নতুন ধরনের স্থায়ী রাসায়নিক পদার্থ আবিষ্কার করেন। এটির নাম ছিল মারকিউরাস নাইট্রেট। তার এই আবিষ্কারের ফলে মার্কারি ও নাইট্রেটের সমন্বয়ে আরও যেসকল রাসায়নিক পদার্থ তৈরি করা যায়, তা নিয়ে গবেষণা শুরু হয়ে যায়। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে নিজের জন্মভূমিতে একটি কো-অপারেটিভ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে পিতার নামে হরিশ্চন্দ্র স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়াও তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করার পরে জৈবিক সালফাইড, স্বর্ণ, প্ল্যাটিনাম, ইরিডিয়াম ইত্যাদি ভারী ভারী ধাতব পদার্থ নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। এসব কাজে সাহায্য করবার জন্য তিনি দক্ষ সাহায্যকর্মী সমন্বিত একটি দলও পান। তিনি তাঁর জীবনকালে প্রচুর সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন। শিক্ষকতার জন্য তিনি 'আচার্য' হিসাবে আখ্যায়িত হন। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য হিসাবে তৃতীয়বারের জন্য তিনি ইংল্যান্ড যান এবং সেখান থেকেই সিআইই লাভ করেন। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি দেয়। এছাড়া ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং পরবর্তীকালে মহীশূর ও বেনারস বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও তিনি ডক্টরেট পান। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি ব্রিটিশ সরকার প্রদত্ত 'নাইট' উপাধি লাভ করেন। তিনি শুধু বিজ্ঞানীই ছিলেন না। সাহিত্যের রসবোধও তাঁর মধ্যে ছিল। তাঁর লেখা বইগুলির মধ্যে 'India Before and After the Sepoy Mutiny', 'সরল প্রাণীবিজ্ঞান', 'বাঙ্গালি মস্তিষ্ক ও তার অপব্যবহার', 'হিন্দু রসায়নীবিদ্যা' উল্লেখ্য। এছাড়াও রয়েছে তাঁর ১৪৫টি গবেষণাপত্র।

বিজ্ঞান কলেজে যোগদানের পর জীবনের শেষদিনগুলিও বিজ্ঞান কলেজের সেই ছোট্ট ঘরে অনাড়ম্বরের সাথেই কেটেছে তাঁর। অধ্যাপক হিসাবে অবসর নেবার পর মাত্র আটবছর বেঁচেছিলেন তিনি। শেষ জীবনে তিনি তাঁর স্মৃতিশক্তি হারিয়েছিলেন, ঠিকভাবে কথা বলতে পারতেন না। অবশেষে ১৯৪৪ সালের ১৬ জুন মাত্র ৮৩ বছর বয়সে বিজ্ঞানসাধক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এই পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে অমরলোকের উদ্দেশে যাত্রা করেন।